Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উনিশ শতকের বাংলা গান ও খ্রিষ্ট-ধর্মগীত

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sayeem Rana
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v49i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.7
Pages	১৩১-১৪০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

উনিশ শতকের বাংলা গান ও খ্রিষ্ট-ধর্মগীত

Check for updates

সাইম রানা*

এক

উনিশ শতকের সূচনালগ্নে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন ও মননশীলতায় পরিণত বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিদেশিদের দীর্ঘকালের শাসন ও শোষণে পরাধীন অপমানিত জাতি তার আত্ম-পরিচয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করল নানা ধরনের উপলব্ধি ও কর্মপ্রক্রিয়া দিয়ে। তখন সমাজ ও সাহিত্যে কতগুলো লক্ষণ চিহ্নিত হলো। যেমন, ধর্মনীতিকে উপেক্ষা করে জীবনধর্মী মানবিক মূল্যবোধের প্রসার, স্বাদেশিকতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা, ভাষা ও দর্শনের মুক্ত প্রকাশ, নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদাদান প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সাথে উঠে এল। এই শতকের শেষ লগ্নে বিদেশি শাসকের আগ্রাসন এবং ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বিদেশি পণ্য বর্জন করলেও সেদেশের চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমুন্নত আদর্শকে সচেতনভাবে গ্রহণ করল বাঙালি বিদ্বৎসমাজ। ফলস্বরূপ, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিটি আঙ্গিকে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন এবং নতুন নতুন ধারার সংযোজন লক্ষ করা গেল। সেই প্রবাহে রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক সংগঠন এবং ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি বাংলা গানেও বয়ে গেল পরিবর্তনের হাওয়া।

উনিশ শতকের বাংলা গানের অনেকগুলো ধারা চিহ্নিত করা যায়। বাংলা টপ্পা, বাংলা ধ্রুপদ, বাংলা খেয়াল, ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশি গান তন্মধ্যে অন্যতম। আঠারো শতকের শেষের দিকে রামপ্রসাদ সেনের (১৭২০-১৭৮১) শাক্ত সংগীত রচনা দিয়ে খণ্ডগীতির বা লঘুগানের সূচনা ঘটে, যার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সংগীত কাঠামো অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালির ন্যায় দীর্ঘগীত থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক যুগে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে বলা যায়। পরবর্তীকালে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬), হরু ঠাকুর, নীলমণি পাটনি, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শাক্ত সংগীতকে আরো সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করে তোলেন।

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা গানের ভুবনে টপ্পার সংযোজন করেন। শোরী মিয়ার[১] পাঞ্জাবি অঞ্চলের টপ্পা প্রেম-হাস্য-তামাশা বা উল্লাসের উদ্দীপনা জাগালেও নিধুবাবু বাংলা টপ্পাকে মহৎ-প্রশান্ত-ভক্তি ও উপাসনার উপযোগী করে তোলেন। হিন্দি শব্দ টপ্পার আদি অর্থ লম্ফ, অন্য অর্থ সংক্ষেপ। সংক্ষেপ বলতে ধ্রুপদ বা খেয়াল থেকে ছোট বোঝায়। নিধুবাবুর পরবর্তীকালে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০), দাশরথী রায় (১৮০৬-১৮৫৭), শ্রীধর কথক (১৮২৮-), গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০-১৮৭২), জগন্নাথ প্রসাদ বসু, মনোমোহন বসু

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৮৩১-১৯১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) টপ্পা রচনায় বিশেষ অবদান রাখেন। উনিশ শতকে প্রেম সংগীতের ধারাও টপ্পা সংগীতের প্রভাবে উৎসারিত হয়েছে।

রঘুনাথ রায়ের (১৭৫০-১৮০৬) শাক্তগীতি রচনায় খেয়ালের প্রভাব দিয়ে বাংলায় খেয়াল গানের সূচনা ঘটে। একইভাবে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) শাক্তগীতি রচনায় ধ্রুপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত করেন। তিনি হিন্দুস্তানি সংগীতাদর্শে ধ্রুপদ শিক্ষা অর্জন করলেও পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর ধ্রুপদের বাংলা ঘরানা গড়ে তোলেন। রঘুনাথের উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), রামকেশর ও কেশবলাল চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদু ভট্ট (১৮৪০-১৮৮৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় ধ্রুপদাঙ্গ ধারার বিকাশ ঘটান।

রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা সংগীত উনিশ শতকের একটি বিশিষ্ট ধারা। অপৌত্তলিক ও অবিচ্ছেদনীয়-নিরাকার উপাসনা সংগীত রচনায় আধুনিকতার সমর্থন করতে গিয়ে এ সময়ের সব ধরনের আঙ্গিককে তিনি গ্রহণ করেছিলেন; বিশেষ করে ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তন, খেয়াল ও পাশ্চাত্য সুরে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। পরবর্তীকালে নিমাইচরণ মিত্র, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ রায়, গৌরমোহন সরকার, নীলরতন হালদার, নীলমণি ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মসংগীত রচনায় ব্রতী হন।

উনিশ শতকের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় বাঙালির জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। কলকাতার শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক প্রভাবসম্পন্ন পরিবারের চিন্তা থেকে স্বদেশী সংগীতের উদ্ভব ঘটে। এসব গানে বাঙালির স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরতা, দেশীয় শিল্পের মূল্যায়ন, সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দান, শারীরিক সামর্থ্যের জন্য দৈহিক শক্তিচর্চা, দুরবস্থা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান ইত্যাদির পথ ধরে ভবিষ্যৎ স্বাধীন সুখ-স্বর্গের বীজ রোপণের প্রত্যয় ঘোষিত হয়। স্বদেশী গান রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫), মুকুন্দ দাসসহ অসংখ্য গীতিকবির অবদান রয়েছে।

দুই

উনিশ শতকে যে আরো বেশ কিছু গৌণ হয়ে যাওয়া সংগীত ধারার প্রচলন ছিল, তা হয়তো বাঙালির নবজাগরণ ও যুগ-স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমের আড়ালে ঢেকে গিয়েছিল। তবে সংগীতের সার্বিক পরিচর্যা ও ইতিহাসনির্ভর সমৃদ্ধির বিচারে ঐসব গানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা গানের আধুনিক ধারার যে বিবর্তন, এখনো তার সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক রূপ গবেষণা জগতে চোখে পড়েনি। তবে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি গ্রন্থ *ভারতী সংগীত মুক্তাবলী*তে এগারো শ্রেণির যে গানের বিভাজন পাওয়া যায়, এতে শ্রেণিভুক্ত হয় ব্রহ্মসংগীতের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত,

সামাজিক সংগীত, পৌরাণিক সংগীত, ঐতিহাসিক সংগীত, শ্যামবিষয়ক সংগীত, হরিনাম বিষয়ক সংগীত ও সংকীর্তন, খ্রিষ্টীয় ধর্মসংগীত ও বিবিধ ধর্মগীত ।

খ্রিষ্টীয় ধর্মগীত এমন এক সময়ে প্রচলিত হতে দেখা যায়, যখন বাঙালির মন ও মনন ধর্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে মানবিকতার বিকাশে উদ্বুদ্ধ এবং নবজাগরণ সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত। যদিও বিতর্ক আছে যে, এই সময়ের কতিপয় বিরোধীদের মতে জাগরণ মূলত 'সীমায়িত সংখ্যক ভদ্রলোকদের বৃত্তেই আবদ্ধ ছিল, ব্যাপারটা অনেকাংশে যাকে বলে 'এলিটিস্ট'। ... কেননা নবজাগরণ তো দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনি কিংবা অগণিত পল্লীবাসীর জীবনে একটুও সদর্থক পরিবর্তন আনে নি।' (সুধীর, ১৩৯৭ : ১)

বিরোধীদের এই কথাটির উপর দ্বিমত না রেখেও একটি বিষয় অনুধাবন করা যায় যে, বাঙালির মনে নবজাগরণের প্রকাশ তৎকালের উচ্চশ্রেণি ও মধ্যশ্রেণির কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে থেকে ঘটলেও তা ছিল জাতীয় জীবনের সার্বিক সংকটেরই সমাধানমূলক বহিঃপ্রকাশ। ফলে শিল্পমাধ্যম হিসেবে নতুন নতুন আঙ্গিক সাধারণ্যের মধ্যে হয়তো তাৎক্ষণিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট উত্তরণের জন্য মানসিক পরিবর্তন অন্তত গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তার প্রমাণ মিলবে শাক্তগীতির পৌত্তলিকতা থেকে সরে এসে খ্রিষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার ঘটনায়। লোকজীবনের গভীরে বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের প্রগতিভাবনা সরাসরি যে মহলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি, সেই মহলের গলি দিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের নিমন্ত্রণ পৌঁছে যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাছাড়া বর্ণবাদ ও জাতবৈষম্যের তিক্ততার কারণে শিক্ষিত সচেতন মহল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। অন্যদিকে ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসে ও ইংরেজি শিখে তৎকালীন বাঙালি মধ্যশ্রেণির একাংশ ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে পরিচয় লাভসহ সমাজ ও ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়। তবে নিম্নশ্রেণির লোকের সহজেই খ্রিষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। জাতভেদের নানা প্রতিবন্ধকতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে গ্রামীণ-সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম এক ধরনের আশীর্বাদ হয়ে আসে। ফলে ধর্মভিত্তিক আদর্শ প্রচারে একদিকে হিন্দু সনাতন সমর্থকদের ভাবান্দোলন, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে নবাগত ইংরেজদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচার — এই ত্রিধাবিভক্ত সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙালির জীবন ও দর্শনে। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য তৎকালীন নবাগত ধর্মাবলম্বীদের জন্য সামাজিক অভিঘাত হয়ে এলেও সেই চ্যালেঞ্জকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। কারণ যে শ্রেণির (উচ্চবর্ণের হিন্দু) মানুষেরা তাদের শ্রেণিস্বার্থ, জাতীয় গর্ব ও গৌরবকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, এককালে তাদের দ্বারাই নিম্নশ্রেণির মানুষেরা শোষিত ও প্রহসনের শিকার ছিল। সেই কারণে নবাগতদের অভিঘাতের সম্মুখীন হওয়াটা এক অর্থে বিজয়ে পরিণত হয়েছিল। তবে নিম্নশ্রেণির ন্যায় উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির মানুষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত না হওয়ার (ব্যতিক্রম রয়েছে) আরেকটি কারণ সাময়িক-পত্র, সাহিত্যচর্চা ও সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টমতাবলম্বীগণ তাঁদের মতাদর্শ প্রচারে মূলধারায় সমান্তরালভাবে বিচরণ করতে পারেনি। ফলে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারার্থে বাংলা গানের নানান ধারাকে আত্মস্থ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। নব্য খ্রিষ্টান বাঙালিদের

লেখা বাংলায় দুই সহস্রাধিক ধর্মগীত প্রাগ্রসর সংস্কৃতিচর্চাকারীদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। তবুও মিশনে ও উপাসনালয়ে এই গানগুলো বহুভাবে প্রচলিত থেকেছে।

মিশনারিদের কর্মকাণ্ড সরাসরি সেবামূলক ছিল, যেমন চিকিৎসা, কৃষি-উন্নয়ন, ঋণদান, শিক্ষা-বিস্তার ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। ধর্মান্তরিত করার দীক্ষায় গ্রামীণ জীবনে এ সব উদ্যোগ প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল বলে ধর্মগীত বা নাটককে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা সচেষ্ট ছিল না মিশনারিগণ। প্রথম দিকে ধর্মগীতগুলো ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গাওয়া হলেও পরবর্তীকালে অসংখ্য নবাগত ধর্মান্তরিত বাঙালি গীত রচনার অংশ নেয়। বাঙালির মুক্তির অন্বেষায় প্রচলিত ধর্মীয় সংঘাতমুখীনতা ও বর্ণবিভেদ এবং প্রথম থেকেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের মনোভাবে এক ধরনের সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা ইত্যাদি কারণও গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। উইলিয়াম কেরীই প্রথম সার্থক প্রোটেস্টান্ট প্রচারক যিনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করানোর পরও তার টিকি কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন নি। উঁচু-নিচু জাতের ভেদাভেদ করেন নি। এর ফলে অন্যান্য ধর্মের ভক্তিগীতির অনুকরণে নবাগত ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় প্রভু যীশুর উদ্দেশে নিবেদিত গীত রচনায় যুক্ত হয়েছিল।

খ্রিষ্টধর্মগীতের আসরে কয়েকটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল:

ক. ভারতীয় যে কোনো সুরকে যেমন লোকসুর, শাস্ত্রীয় সুর, আধুনিক সুরকে আত্মীকরণ করা।

খ. যে কোনো ধর্মের পৌত্তলিকতা বর্জিত একেশ্বরবাদী ভক্তিগীতিকে উপাসনাগীত হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন নাথগীতি, ব্রহ্মগীতি, কাওয়ালি ইত্যাদি গির্জায় উপাসনা সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

গ. পাশ্চাত্য ক্যারল সংগীতকে বাংলা অনুবাদ ও সুরে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তিন

উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণ সংগঠিত ও বিকশিত হওয়ার পিছনে এবং তাঁদের চিন্তাধারা ও আত্ম-আবিষ্কারের প্রচারণা হিসেবে যে সকল পত্র-পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, তন্মধ্যে 'দিগদর্শন', 'সমাচার দর্পণ', 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'সম্বাদকৌমুদী', 'সমাচারচন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত', 'সম্বাদ প্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'জ্ঞানোদয়', 'বিজ্ঞানসেবধি', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'তত্ত্ববোধিনী' অন্যতম। (কাসেম, ১৯৭৯ : ১৫৫) প্রথমসারির এ সকল পত্র-পত্রিকায় বা সাময়িক পত্রে খ্রিষ্টসংগীত নিয়ে আলোচনা স্থান না পেলেও মিশনারিদের নিজস্ব প্রকাশোদ্যোগ এবং সংরক্ষণ প্রবণতা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। ১৮০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম *খ্রীষ্টীয় গীত-পুস্তক* প্রকাশিত হয়। ২৩টি গীত সংবলিত পুস্তকটি পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায় নি। ১৮১০ সালে একই প্রেস থেকে জন চেম্বারলেন রচিত *গীত-পুস্তক*-এ ১৫৭টি গীত এবং ১৮টি গীতসংহিতা প্রকাশিত হয়েছিল। একজনের লেখা এই পুস্তকের সমস্ত গানই পাশ্চাত্য সুরে বাঁধা ছিল। ১৮১৮ সালে এই মিশন থেকে একটি বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *যীশু খ্রীষ্টের*

মণ্ডলীতে গেয় গীত নামে। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রথমভাগে সংকলিত হয় ২০টি গান, যার লেখক হলেন ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রচারের চার অগ্রদূত ড. জন টমাস, উইলিয়াম কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডস। দ্বিতীয় ভাগে পূর্বপ্রকাশিত চেম্বরলেনের গীতসমূহ এবং তৃতীয় ভাগে ছাপা হয় বাংলার নবদীক্ষিত গীতরচয়িতাদের ১২৭টি গান।

১৮২৬ সালে কলিকাতা চার্চ মিশন প্রেস থেকে রেভা. থিয়োফিল্ড রেকার্ডের (টি. আর) রচিত *গীত-পুস্তক* মুদ্রিত হয়। এর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য সুরে ১৪১টি এবং দ্বিতীয় ভাগে বাংলার লোকসুরে ৭২টি গীত স্থান পেয়েছিল। ১৮২৯ সালে নতুন সংস্থা খ্রিষ্টীয়ান ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটি *ধর্ম্মগীত* নামক আরেকটি সংকলন বের করে। এতে ১৫৭টি গীত ছিল এবং প্রতিটি গানের শীর্ষদেশে বাংলায় বিষয় অনুযায়ী নাম ছিল। ১৮৪৫ সালে সম্মিলিত ব্যাপ্টিস্টমণ্ডলীর অনুরোধে রেভা. জর্জ পিয়ার্স *ধর্ম্মগীত* নামে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রায় ৩০০ গানের এই সংকলনে ইংরেজি ও বাংলা প্রত্যেক গীতের বিষয়ানুযায়ী নাম মুদ্রিত ছিল। ১৮৬০ সালে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ বের হলে সেখানে আরো ৪০টি নতুন গান সংযুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সংগ্রহকর্তা পিয়ার্সের ৭২টি গান এ বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৭৫ সালে ডাক্তার ওয়েঙ্গার *ধর্ম্মগীতের* নতুন ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বের করেন। ১৮৭৭ সালে পুনরায় ছাপা হলে তাতে সর্বমোট ৪৪৮টি মুদ্রিত গানের ৬০টি ছিল পাশ্চাত্য সুরে রচিত। ১৮৭৫ সালে মুন্সী আজিজবারি রচিত *সামপুস্তক ও পরমেশতত্ত্বগীতা* নামে একটি বড় গ্রন্থ বের হয়। রচয়িতা এই গ্রন্থে গীতসংহিতার গীতা অবলম্বনে অনেক গীত রচনা করে সামপুস্তক প্রণয়ন করেন। এই কালপর্বের মধ্যেই মিশনের বাইরে সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রকাশিত কিছু পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন অমৃতলাল নাথের *গীতামৃত*, মধুসূদন সরকারের *গীতরত্ন* গ্রামীণ হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। ১৮৭৭ সালে নৃপালচন্দ্র বিশ্বাস অনুদিত একশটি গানের সংকলন *গীতসংগ্রহ* প্রকাশিত হয়। মেথডিস্ট গীত-পুস্তক নামে এই গ্রন্থটি ১৮৮৬ এবং ১৯০৭ সালে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হয়। এতে ৭১৩টি গান স্থান পায়, এর মধ্যে ৫০০টি গান নৃপালচন্দ্রেরই লেখা। ১৮৮৪ সালের আগে আরেকটি গ্রন্থ বের হয় ২৩৯টি গীত সমন্বয়ে — আঙ্গলিকান মণ্ডলী ব্যবহৃত গ্রন্থটির নাম *পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মগীত*। ঐ সালে গ্রন্থটি বরদাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় ৫৪৫টি গান নিয়ে নতুনভাবে বের হয়, এর ২০০টি গান যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস এবং ৮০টি গান রেভা. আর. পি. গ্রীভ্স-এর লেখা ছিল। গ্রন্থের অধিকাংশ গান পাশ্চাত্য সুর অবলম্বনে গাওয়া হতো। ১৮৯০ সালের পর আরো কিছু গ্রন্থ বিভিন্ন মিশন থেকে বের হয়; যেমন মেথডিস্ট এপিস্কোপাল মিশনের গীত, মেদিনীপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের গীত, বরিশালের বারাইরো সাহেবের রচিত ৪০০ গীত, চার্চ অব গড মিশনের গীত ইত্যাদি।

১৮৭০ সালে আচার্য চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলন *খ্রীষ্ট-সঙ্গীত* গ্রন্থে বাংলা সুরের ২৪৬টি গীত বের হয়। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত এর নতুন সংস্করণে নতুন আরো কিছু লেখা সংযোজিত হয়ে মোট ৩৬৯টি গীত সংকলিত হয়। ১৮৯০ সালে *গীতিহার* নামে একটি সংকলন ছয়টি মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে খুলনা থেকে *সঙ্গীত*

কুসুমাবলী, ১৮৯২ সালে রাজেন ফকিরের *খ্রীষ্টীয় গীতানন্দ*, ১৮৯৩ সালে মথুরানাথ বসুর *সিয়োন গীত*, ১৮৯৬ সালে বিন্দুনাথ সরকারের *সঙ্গীত রত্নহার* উল্লেখযোগ্য ভাবচর্চার অংশীদার হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন ছোট ছোট পুস্তক যেমন ফিলিপ বিশ্বাসের *সঙ্কীর্তন সহচর*, গোপালগঞ্জের মধুসূদন সরকারের লেখা *ত্রাণগীত*, ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *ঈশতত্ত্ব সঙ্গীত*, খ্রিষ্টীয় সেবক সমিতির *সেবক সঙ্গীত*, রেভারেন্ড জে. এফ. হিউয়েট-এর সংকলিত *সঙ্গীতমালা* গ্রন্থগুলো বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাজারে প্রচলিত ছিল।

১৮৭০ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে শিশুদের জন্য ও তাদের গাইবার জন্য রচিত *শিশুদিগের গীত-পুস্তক* প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে রেভা. জন পেঙ্গওয়েন জোন্স সাহেব নতুন প্রণালীতে গীত রচনা করতে থাকেন এবং *শিশুসঙ্গীত* নামে একটি গ্রন্থ ও স্বরলিপি বের করেন। বিজয়নাথ সরকার একই সময় *সণ্ডেস্কুল সঙ্গীত* এবং ১৮৯৬ সালে *স্নেহময় গীত* ও ১৯০৫ সালে *প্রেমগীত* প্রকাশ করেন।

১৮৯১ সালে ব্যাপ্টিস্ট বঙ্গীয় কনফারেন্সের অনুরোধে রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী *ধর্মগীতে*র এক নতুন সংস্করণ বের করেন। এতে পুরাতন কিছু পরিত্যক্ত গীত বাদ দিয়ে নতুন কিছু গান যোগ করা হয়। ১৯১১ সালে আবার তাঁরই সম্পাদনায় ৫০০ গান সহযোগে *ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগীত* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ভবানীপুর কনগ্রীগেশনাল মণ্ডলীর আচার্য সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রনাথ পাঁড়ের প্রকাশিত *খ্রীষ্টসঙ্গীত* এবং সেন্ট মেরীজ মণ্ডলীর আচার্য মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও নিশিকান্তের প্রকাশিত *খ্রীষ্ট-সঙ্গীত* দু'টি গ্রন্থই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পাঠ্য ছিল। প্রথমটিতে ৩৮৪টি বাংলা গান ও ৩৪টি ইংরেজি গান ছিল আর দ্বিতীয়টিতে ২৮৩টি বাংলা এবং ৮৪টি ইংরেজি সুরের গান স্থান পেয়েছিল।

১৯২৩ সালে ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশন থেকে ৭১৩টি গানের সংকলন *মেথডিষ্ট সঙ্গীত-সংগ্রহ* নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালে সি. এম. এস. ৩৮১টি ইংরেজি গান সহযোগে ৬৩৫টি গানের সংকলন *ধর্মগীত* বের করে। একই সময়ে আরো দুটি গ্রন্থ *গানের বই* এবং *আনন্দ-সঙ্গীত* নামে প্রকাশিত হয়।[২]

১৯১৮ সালে কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস মুদ্রণ করে বাংলা গানের অন্যতম ঐতিহাসিক সুর-দলিল *ধর্ম্মগীতের স্বরলিপি* (A Tune-book for Dharma Gita), উপ-শিরোনামে বলা হয় In Staff-notation and Tonic Sol-fa। বাংলা গানে পাশ্চাত্য স্বরলিপি প্রয়োগ এবং পাশ্চাত্য সুরের অকাট্য নিদর্শন হিসেবে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। ৪০৬টি আন্তর্জাতিক পদ্ধতির স্বরলিপিতে ছাপা অনন্য এ গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এতে একদিকে ভারতীয় রাগ-রাগিণী নির্ভর সুর এবং বাংলার লোকগীতির বিভিন্ন সুর স্টাফ নোটেশনের নিয়মে আবদ্ধ করা হয়েছে, অন্য দিকে ভারতীয় সংগীতের সাথে পাশ্চাত্য সংগীত স্বরলিপি পদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করা হয়েছে [চিত্র : ১]। দীর্ঘ সাত বছর ধরে সম্পাদিত ও স্বরলিপি প্রণীত এই গ্রন্থ সম্পর্কে উইলিয়াম কেরী বলেন :

> The task involved great labour, patience and resource. It has taken nearly seven years to complete. Some of the tunes, if previously unknown, may

present a little difficulty at first to the reader, as Indian time is not easily expressed in western forms of musical notation. But the book will be a boon to all leaders familiar with these forms among the scattered Christian congregations of Bengal, enlarging the number of the hymns available for use, and recalling at will tunes forgotten or only half-remembered. (কেরী, ১৯১৮ : ভূমিকা)

চার

উনিশ শতকের খ্রিষ্টধর্মগীতের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল গানগুলোকে জনপ্রিয় করার জন্য অনেকটা দেশি জনপ্রিয় সুররীতির আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে লোক বা চারণ কবি ছিলেন না বলে বাংলার অন্যান্য ভক্তিগীতের সাবলীলতা ও ভাষালাবণ্যের সাথে একই প্রবাহে মিশে যেতে পারেননি। যেমন, একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ভাটিয়াল ঠুংরি সুরে যিশুর উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে :

আমার রাখাল কভু ঘুমান না
আমার আর কিসের ভাবনা॥
সে যে তৃণভূষিত স্থানে চরান, হে–
আমার অসুসার আর হইবে না॥

১৮৯৬ সালে রচিত মধুসূদন সরকারের লেখা এই গানটিতে গ্রাম বাংলার অতি সহজ সরল সুর ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গানটি গাইতে গেলে 'ঘুমান না', 'তৃণ-ভূষিত', 'অসুসার', 'চরান' এই ধরনের শব্দ সহজাত বা আপন বলে মনে হয় না। বাংলা ভক্তিগীতিতে ঈশ্বরের প্রতি 'সম্মান' অপেক্ষা 'প্রেম' অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। যার কারণে 'আপনি' অপেক্ষা 'তুমি' এমনকি কখনো 'তুই' সম্বোধন বেশি কার্যকর হয়েছে। যেমন :

'তব প্রেমে দয়াময়, পূর্ণ কর এ হৃদয়,
আসি সম্মুখে দাঁড়াও, দেখি রূপ নয়ন ভরে॥'

অতএব 'ঘুমান না' বা 'চরান' শব্দগুলো যেমন জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না তেমনি ভাটিয়ালি সুরের সাথেও একসুতোয় পাকিয়ে উঠতে পারে না। 'তৃণ-ভূষিত' এবং 'অসুসার' শব্দদ্বয় আধুনিক সুশীল সমাজের সাহিত্যচিন্তা চর্চার একপ্রকার স্মার্ট ভাষা, যা লোকসাহিত্যে বিরল। এ বিষয়ে বাংলা ব্যাপ্টিস্ট সংঘের সদস্যবৃন্দের পক্ষে সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

ভক্তিমূলক গীতাবলি বাঙ্গালা দেশে চিরদিনই প্রচলিত, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাদর্শ সম্বলিত সঙ্গীতের অপ্রাচুর্য বহুদিনই পরিলক্ষিত হইয়াছে, কারণ খ্রীষ্টীয় সমাজে স্বভাব কবির অভাব। এবং আরও নূতন শব্দ ও ভাব একটী ভাষায় পূর্ণাঙ্গীভূত হইতে সময়ের প্রয়োজন। খ্রীষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সমুদয় নূতন আদর্শ, শব্দ ও ভাব বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান সমাজে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের বঙ্গভাষায় লিখিত কবিতায় ব্যবহারের উপযুক্ত শব্দরূপে রূপান্তরকৃত হইতে সময় লাগিয়াছে। (সুধীর ও অন্যান্য, ১৯৫১ : ভূমিকা)

চিত্র ১.২ : রেভ. উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৯১৮ সালে প্রকাশিত ধর্ম্মগীতের স্বরলিপি গ্রন্থের নমুনা।

তবে পশ্চিমা মিশনারিদের ইংরেজি ও অনুদিত বাংলা গীতের পাশাপাশি অগণিত বাঙালি রচয়িতা যে গান রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহের তথ্য থেকে অনুধাবন করা যায়। যে সকল গীতিকবির রচনা উনিশ শতকের খ্রিষ্টীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছিল তাঁরা হলেন : মথুরানাথ বসু, ঈশানচন্দ্র দাস, রামচরণ ঘোষ, অমৃতলাল নাথ, বিন্দুনাথ সরকার, যদুনাথ সোম, রমানাথ পালিত, সন্তোষকুমার পাত্র, অনীল সরকার, রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র সরকার, ফুলসাহা বিশ্বাস, অমৃতলাল সরকার, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, গগনচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, তারাচাঁদ দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ স্যান্নাল, শলোমন বিশ্বাস, কে এল বিশ্বাস, এম সেন, বিজয় নারায়ণ সরকার, অন্ধ হরি, প্যারীমোহন রুদ্র, প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কবিরাজ, দুর্গাকান্ত চক্রবর্তী, যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস, কৃষ্ণপাল, প্রেমচাঁদ নাথ, কালাচাঁদ মণ্ডল, ফিলিপ টমাস বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র সরকার, বেঞ্জামিন বারৈ, জ্ঞান গোস্বামী, জন পেঙ্গওয়েৰ্ন জোন্স, রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী, জর্জ পিয়ার্স, পি এন বৈরাগী, গুলজার শাহ, আর পি গ্রীভ্স, সি ডব্লিউ লিপ, জে এ ডি ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ। তবে বেশ কিছু গান বিভিন্ন ভক্তিগীতি থেকে আসা; যা তাঁরা সংগ্রহ করতেন। এর প্রমাণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, আলাউদ্দিন খাঁ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের বেশ কিছু গান বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্তি হতে দেখা যায়।

তবে খ্রিষ্ট-ধর্মগীতগুলো যে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিণতরূপ লাভ করেছে এবং তৎকালিন উদ্ভূত সাংগীতিক ধারার সাথে এর ভাবের যোগ ছিল তার প্রমাণ মিলছে বেশকিছু রাগ ও তালের প্রয়োগ দেখে। যেমন উনিশ শতকে বাংলা খেয়ালের প্রচলনের কারণে এই গানগুলোতে খেয়াল ও রাগ-রাগিণীর প্রভাব লক্ষ করা গেছে আবার 'মধ্যমানে'র মতো নতুন তাল পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়েছে। যে সমস্ত রাগ-রাগিণী, লোকসুর ও আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

রাগ-রাগিণীর মধ্যে ঝিঁঝিট, কালাংড়া, বাহার, লুম, সিন্ধু, বেলাওল, ভীমপলশ্রী, বেহাগ, সুরট-মল্লার, ভৈরবী, ললিত, খাম্বাজ, মুলতান, বেহাগ, কাফি, লুম-ঝিঁঝিট, ইমন-কল্যাণ, বসন্ত, বাহার, পরজ, সোহিনী, ভৈরব, আশাবরী, বিহঙ্গড়া, সাহানা, দেওগিরি, আলেয়া, টোড়ি, বাঁরোয়া, বাগেশ্রী, মালকোষ, গৌর-সারং, পাহাড়ি, গৌরী, রামকেলী, সরফরদা, গারা-ভৈরবী, বিভাস, মিশ্র-মল্লার, দেশ, বড়হংস, সারঙ্গ, মিশ্র-ভূপালী, আনন্দ-ভৈরবী, পিলু, জয়জয়ন্তী, টঙ্কা, বিভাস, বসন্ত-বাহার ইত্যাদি। এছাড়াও বেশকিছু গানের আঙ্গিকে জংলা-ঠুংরী, কীর্ত্তনাঙ্গ, কাওয়ালী, বাউল, হিন্দি-ভজন, ভাটিয়ালি, লক্ষ্মৌ-গজল, ধ্রুপদ, নীলকণ্ঠ রায়ের সুর, রামপ্রসাদী, টপ্পা প্রভৃতি সুর গ্রহণ করা হয়েছে। তালের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা যায়, যেমন আড়াঠেকা, কাওয়ালী-খেমটা, জৎ, একতালা, ঢিমে-তেতালা, ঝাঁপতাল, চৌতাল, খেমটা, মধ্যমান, তিওট, কাহারবা, আড়া-খেমটা, তিওড়া, খয়রা, পোস্ত, আড়া, শ্লথ-ত্রিতালী, ঠাস-কাওয়ালী, ধামার, রূপক ইত্যাদি।

পরিশেষে যে কথা বলা আবশ্যক, বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম বহিরাগত ধর্ম হিসেবে ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের মাধ্যমে এদেশে প্রবেশ করে। তখন থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত অর্থাৎ

প্রায় দুশ বছর ক্যাথলিকদের প্রচারকাজ সাফল্যের সাথে চলতে থাকে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের আদিবাসী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাথলিক গির্জা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মাদর্শের প্রসার ঘটে। তাঁদের উপাসনা সংগীতের প্রায় পাঁচশ বছরের ইতিহাসে সহস্রাধিক উপাসনা সংগীত রচিত হয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের প্রধান ধারার সংগীত পরিমণ্ডলে কখনো এই গান আশ্রয় পায়নি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংগীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ও আঙ্গিকগত ভিন্নতায় এই গানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম অন্তত সুরবৈচিত্র্যে। এই প্রবন্ধে শুধু ব্যাপ্টিস্ট প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের সংগীত পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করা হলো। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সংগীত ইতিহাসের অতলে যেমন বাস করছে অফুরান শিল্পৈশ্বর্য, তারই অনতম অংশীদার এই খ্রিষ্টগীত। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এবং বাংলায় সার্থকরূপে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পাশ্চাত্যগীতি অনুবাদ এবং হুবহু সুরে বসানোর চর্চা বাংলায় এই প্রথম বলে অনুমান করা যায়। সংগীত উন্নয়ন ও গবেষণার গুরুত্ব হিসেবে তাই এই গানগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম।

টীকা

১ শোরী মিয়ার আসল নাম গোলাম নবী। তিনি প্রিয়তমা প্রণয়িনী শোরীর নামে ভণিতা গাইতেন। এ জন্যই তাঁর পরিচয় ধীরে ধীরে শোরী মিয়া টপ্পা প্রণেতা হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠে।

২ প্রবন্ধের গ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ ১৯৫১ সালে প্রকাশিত *সাধারণ ধর্ম্মগীত* গ্রন্থের ভূমিকা থেকে সংগৃহীত। সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায়, ওয়াল্টার জি গ্রিফিথস, শ্রী রণজিৎ রায়, শমুয়েল শরৎ কুমার দাস, সন্তোষ কুমার বিশ্বাস প্রমুখের তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থের ভূমিকাটি প্রকাশ পায়। (সুধীর ও অন্যান্য, ১৯৫১ : ভূমিকা)

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল কাসেম ফজলুল হক, ১৯৭৯। *প্রবন্ধ : উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (নবম সংখ্যা), ঢাকা।

উইলিয়াম কেরী (কনভেনর), আগস্ট ১৯১৮। *ধর্ম্মগীতের স্বরলিপি (A Tune-book for Dharma Gita)*, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, কলিকাতা।

করুণাময় গোস্বামী, ১৯৯৩, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, ওয়াল্টার জি গ্রিফিথস, শ্রী রণজিৎ রায়, শমুয়েল শরৎ কুমার দাস, সন্তোষ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ সম্পাদিত, ১৯৫১। *সাধারণ ধর্ম্মগীত*, বঙ্গীয় ব্যাপ্টিস্ট মিশন, কলিকাতা।

সুধীর চক্রবর্তী, ১৩৯৭। *বাংলা গানের সন্ধানে,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।